করোনার সঙ্গে ডেঙ্গু

অধ্যাপক এবি এম আব্দুল্লাহ

করোনা মহামারির মধ্যে নতুন করে শুরু হয়েছে ডেঙ্গুর তান্ডব। সারা পৃথিবীসহ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা করোনার তান্ডবে বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত, পার করছে ক্রান্তিকাল। প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের আঘাতে আমাদের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশেষ করে চিকিৎসাক্ষেত্র অনেকটাই হুমকির মুখে। কোনো হাসপাতালে শয্যা, ওয়ার্ড, আইসিইউ, এইচডিইউ খালি নেই। রোগীদের অক্সিজেন, ভেন্টিলেশনের সংকট কাটিয়ে ওঠা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কর্মরত ডাক্তার, নার্স, আয়া, ওয়ার্ডবয় এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, আতঙ্কগ্রস্ত। চলমান করোনা দুর্যোগের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে গেছে। এপ্রিল-মে থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুর সময়। এটা প্রতিবছর হয়েই থাকে, ২০১৯ সালের অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে। কিন্তু এবছর হঠাৎ করে করোনার তান্ডবের পাশাপাশি ডেঙ্গুর হানা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। অন্যান্য জেলায় ডেঙ্গু কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকলেও রাজধানীতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার প্রতিদিন বেড়েই চলছে। করোনার তান্ডবে ডেঙ্গুর হানায় রাজধানীবাসীরা নাকাল।

ডেঙ্গু হলে জ্বর তীব্র মাত্রার হয়, ১০৩ থেকে ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। মাথাব্যথা ও চোখের পেছনে ব্যথা এবং গায়ে, কোমর, শরীর ও গিরায় গিরায় প্রচন্ড ব্যথা হয়। এটাকে ‘ব্রেক বোন ফিবার’ বা 'হাড়ভাঙা' জ্বর বলে। জ্বরের চার-পাঁচ দিন পর সারা শরীরে লাল এলার্জির বা ঘামাচির মতো র্যা শ উঠতে পারে। প্লাটিলেট কমে নাক,মুখ, দাঁতের মারি থেকে রক্তক্ষরণ, রক্তবমি ও কালো পায়খানা হতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে তাকে বলে 'ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিবার’। রক্তনালির ভেতর থেকে রক্তরস বেরিয়ে পেটে, বুকে পানি জমতে পারে। কোন কোন রোগীর 'ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম' হতে পারে যেটি মৃত্যুর কারণ হয়। ৪-৫ দিন পর পর জ্বর কমে যায়, এ সময়েই এই জটিলতাগুলো দেখা দেয়, একে বলে 'ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড'।

করোনায়ও জ্বর হয়, তবে এতটা তীব্র মাত্রার নয়। কোভিড বারবার তার চরিত্র বদলাচ্ছে। বর্তমানে যে ধরনটি ছড়িয়ে পড়ছে তাতে জ্বর তীব্র মাত্রার নয়, আবার দীর্ঘস্থায়ীও নয়। দু–তিন দিনের মাথায় জ্বর সেরে যায়। আবার কোনো জ্বর বা উপসর্গ ছাড়াও অনেক আক্রান্ত রোগী দেখা যায়। অন্যান্য লক্ষণগুলো হলো মাথাব্যথা, শরীরব্যথা, ক্লান্তি, অবসাদ, গলাব্যথা, সর্দি, কাশি। এর সাথে অরুচি ও নাকে ঘ্রাণ বা গন্ধ না পাওয়া কোভিডের একটি বড়ো লক্ষণ, তবে সবার তা নাও হতে পারে। কারো কারো পেটে ব্যথা, ডায়রিয়াও হতে পারে। কোভিডেরও জটিলতা শুরু হয় জ্বর কমে যাওয়ার পর, কারো পাঁচ সাত দিন পর। ফুসফুসের সংক্রমণের হার সামান্য থেকে অনেক ভয়াবহ হতে পারে। ফলে কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকেব্যথা এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যেতে পারে। এই সময়ে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে অক্সিজেন দিতে হয়। প্রয়োজনে আই সি ইউ বা এইচডিইউতে স্থানান্তর করতে হয়, তা নাহলে রোগী মারাও যেতে পারে।

ডেঙ্গুজ্বর এবং কোভিড -১৯ দুটোই ভাইরাসজনিত রোগ হলেও দুটোর মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। দুটোতেই জ্বর প্রথম ও প্রধান উপসর্গ। ডেঙ্গুতে জ্বরের মাত্রা তীব্র হতে পারে, ১০৩ থেকে ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত, আর করোনায় জ্বর এতটা তীব্র হয় না। ডেঙ্গুতে শরীরের যেকোনো অংশে ব্যথা প্রচন্ড হতে পারে,তবে করোনাতে ব্যথা হলেও অতোটা প্রচন্ড আকার ধারণ করে না। ডেঙ্গুতে জ্বরের ৪-৫ দিনের মাথায় শরীরে রেশ হতে পারে, এমনকি রক্তের প্লাটিলেট কমে গিয়ে শরীরের যেকোনো অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

করোনায় শরীরে রেশ হয় না, এমনকি প্লাটিলেট কমে গিয়ে রক্তক্ষরণের ঝুঁকিও তেমন নেই। ডেঙ্গুতে রক্তনালির ভেতর থেকে রক্তরস বেরিয়ে এসে পেটে, বুকে পানি জমতে পারে। এই জটিলতা করোনায় হয় না। করোনায় সবচেয়ে আক্রান্ত করে ফুসফুস। ফলে শ্বাসকষ্ট, কাশি, বুকে ব্যথা এবং শরীরের অক্সিজেন কমে যেতে পারে। এছাড়াও করোনায় শরীরের যেকোনো অংশ আক্রান্ত হতে পারে যেমন লিভার, কিডনি, হার্ট, ব্রেন, এমনকি রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। এ ধরনের জটিলতা ডেঙ্গুতে খুব কম সংখ্যক রোগীর হতে পারে। তাকে বলে' এক্সপানডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম'।

যেহেতু এখন দুটো রোগের ব্যাপক সংক্রমণজনিত ক্রান্তিকাল চলছে, আবার একই রোগী কোভিড এবং ডেঙ্গুজ্বরেও আক্রান্ত হতে পারে। তাই জ্বর হলে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। পরিবারে ছোটো–বড়ো যে কারো জ্বর হলে সতর্ক হতে হবে। ডেঙ্গু জ্বরের জটিলতা শিশুদের বেশি হয়, এমনকি মৃত্যুহারও শিশুদের বেশি। আবার কোভিডে বয়স্ক, যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, কিডনি রোগ ইত্যাদি আছে তাদের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য দুটি রোগই ঝুঁকিপূর্ণ। দুটি সংক্রমণই আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে, একটা মশার কামড়ের মাধ্যমে, অন্যটা ছোঁয়াছুয়ি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে। তাই জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ হলে নিজেকে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা করে নেবেন। আলো বাতাসপূর্ণ একটি আলাদা কক্ষে বিশ্রাম নিন । প্রচুর পানি, তরল ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন। যত দ্রুত সম্ভব টেলিফোনে, অনলাইনে বা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডেঙ্গু নির্ণয়ের জন্য এনএসওয়ান অ্যান্টিজেন

আর কোভিড নির্ণয়ের জন্য আরটি–পিসিআর বা রেপিড এন্টিজেন টেস্ট করে ফেলুন। এছাড়া রক্তের কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট দুই ক্ষেত্রেই দরকার হবে। পরে দুটি রোগের জন্য আলাদা কিছু পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে এর ওর কথায় বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ওষুধ খাবেন না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। কারণ রোগ শনাক্ত না করে ওষুধ খাওয়া বিপজ্জনক। ডেঙ্গুতে জ্বর বা ব্যথায় প্যারাসিটামলের বাইরে অন্য কোনো ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া যাবে না। তাতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এমনকি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো এন্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত হবে না। পাশাপাশি পানি ও শরবত এগুলো বেশি বেশি খেতে হবে। মৃদু কোভিডের ক্ষেত্রেও তেমন কোনো ওষুধ লাগে না। এ রোগেরও কোনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই, লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা দিতে হয়। তাই আলসেমি না করে রোগাক্রান্ত হওয়ার পরপরই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। নিজেদের ইচ্ছামতো ওষুধ খাওয়া যাবে না। অক্সিজেনের মাত্রা ৯২/৯৩-এ নেমে এলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

করোনা এবং ডেঙ্গু দুটোই ভাইরাসজনিত, একই ব্যক্তির ডেঙ্গু ও কোভিড একসঙ্গেও হতে পারে এবং ঝুঁকিটা হয় সবচেয়ে বেশি। তাই জ্বর, সর্দিকাশি ও গলাব্যথা হলে ডেঙ্গু এবং করোনা দুটিরই পরীক্ষা করাতে হবে। ওষুধ-পরীক্ষা সবকিছুই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হবে। অবহেলা করা যাবে না। দুটি রোগের চিকিৎসা একসঙ্গেই চলতে পারে। তবে বেশি সতর্কতা দরকার হয়। কারণ কোভিডে রক্ত জমাট না বাঁধার জন্য রক্ত তরলীকরণের ওষুধ দেওয়া হয়, ওদিকে ডেঙ্গুতে রক্তক্ষরণ একটি বড়ো সমস্যা। এসব চিকিৎসা অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে নিতে হবে।

ডেঙ্গু ও কোভিড দুটোই প্রতিরোধযোগ্য। বর্তমান সময়ে এ ধরনের রোগীর আক্রান্ত হওয়ার হার ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, হাসপাতালগুলো পরিপূর্ণ, তখন সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা যায় এডিস মশা নির্মূলের মাধ্যমে। জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। আর এই ডিম থেকে লার্ভা এবং পরে ডেঙ্গুবাহিত এডিস মশার বংশবিস্তার হয়। এ ছাড়া বৃষ্টির জমা পানিতে মশা ডিম পারে এবং তা থেকে লার্ভা হয়ে এডিস মশা হয়। এভাবেই ডেঙ্গু মশা বেড়ে যাচ্ছে। এগুলো আবার বাসাবাড়িতে ঢুকছে। কারণ এই মশা বাসাবাড়িতে থাকতে পছন্দ করে। এ জন্য কেউ কেউ এ মশাকে 'গৃহপালিত' এমনকি' ভদ্রমশা'ও বলে। নিজের বাসাবাড়ি, আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। টবের নীচে, বারান্দায়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের নীচে, বাথরুমে, ফুলের টবে, বালতিতে, চৌবাচ্চায় এবং ঘরের আনাচে কানাচে জমা পানি থাকলে সেখানে মশা ডিম পাড়ে। তাই কোথাও যেন তিন থেকে পাঁচ দিনের বেশি জমা পানি না থাকে। ঘরের আনাচে কানাচে পরিষ্কার রাখতে হবে। ফ্রিজের নীচে টবে পানি যেন না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেকে ছাদবাগান করে, সেখানে পানি জমার সম্ভাবনা থাকে। সেখানে সতর্কতার সঙ্গে পানি পরিষ্কার করতে হবে। নিজেকে মশার কামড় থেকে বাঁচাতে হবে । মশাগুলো দিনে কামরায়, তাই দিনের বেলা মশারি টানিয়ে ঘুমাবেন। ফুলহাতা জামাকাপড় এবং বাচ্চাদের ফুলপেন্ট পরাবেন। রিপেলেন্ট ক্রিম লাগাতে পারেন। ঘরের বাইরের কাজকর্ম সিটি কর্পোরেশন বা প্রশাসনের দায়িত্ব। কোনো খোলা পাত্র,ডাবের খোসা, পরিত্যক্ত টায়ারে বা গ্যারেজে যেন পানি না জমে থাকে। নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটাতে হবে এসব জায়গায়। এডিস মশার ডিম এক বছর পর্যন্ত পরিবেশে বা মাটিতে টিকে থাকতে পারে। বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে এলেই ডিম থেকে লার্ভা এবং পরে তা পূর্ণাঙ্গ মশা তৈরি হয়। তাই পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিধন অভিযান কেবল বর্ষায় নয়, সারাবছর ধরে চালাতে হবে। পাড়া–মহল্লার সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে তাহলেই মশামুক্ত থাকা যাবে।

অন্যদিকে কোভিডের হাত থেকে নিরাপদে থাকতে হলে স্বাস্থ্যবিধি ভালোভাবে মানতে হবে। অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। যেকোনো সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়ার চর্চা চালু রাখতে হবে। অন্যের সঙ্গে ন্যূনতম ৩ ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। জনবহুল এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে। গণজমায়েত, জনসমাগম থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এর পাশাপাশি অবশ্যই টিকা নিতে হবে।

কঠোর লকডাউন উঠে গেছে, তার মানে এই নয় যে অকারণে বাইরে ঘুরে বেড়াবেন, হইচই করবেন, পার্টি করবেন। প্রয়োজন ছাড়া বাইরে এক মুহূর্তও নয়, আর সর্বদা ঘরের বাইরে গেলে মাস্ক পরতে হবে। মনে রাখতে হবে, নিজেকে সুরক্ষিত রাখা মানেই পরিবার পরিজনকে সুরক্ষিত রাখা। ডেঙ্গু রোগের শত্রুটি দৃশ্যমান অর্থাৎ এডিস মশা, কিন্তু করোনার শত্রু অদৃশ্য। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে হলে মশা নির্মূল করতে হবে এবং এডিস মশার কামড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। আর করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচার দুটি পথ- স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং টিকা নেওয়া।

#

লেখক- মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

০৪.১২.২০২১ পিআইডি ফিচার